**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 466- 471
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.232**

# সত্যজিৎ রায়ের কলমে বহির্জাগতিক প্রাণীর রূপায়ণ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

**সুরজিৎ সাহা,** *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 20.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Scientists have not been able to get the clarity of the existence of any life in the universe beyond earth till date. Nonetheless, people many a time demand of witnessing extraterrestrial life on earth. Moreover, a group of people feel that apart from our earth also, life exists in other planets of our solar system. They firmly assert that these extraterrestrial lives seem to have been visiting our planet almost regularly for many years, even though, there is hardly any scientific evidence published till now. However, a posse of science fiction writers frequently have brought life on other planets as a dominant subject of their literary works. Renowned writer Satyajit Ray can be referred in this aspect who most widely brought extraterrestrial life as popular subject in many of his stories. This research article attempts to focus how new ideas and thought about extraterrestrial life have been explored in his stories.

**Keywords:** Extraterrestrial, Satyajit Ray, Earth, Planet, Scientist, Universe

পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা এখনও কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি। তবুও অনেকেই পৃথিবীতে বহির্জাগতিক প্রাণীকে দেখার দাবি করে থাকেন। পৃথিবীর একাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন যে, অন্য গ্রহেও জীবের অস্তিত্ব আছে। তাঁরা দাবি করেন যে, বহির্জাগতিক জীবরা পৃথিবীতে বহুবছর পূর্ব থেকেই প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করে। তবে এমন ঘটনার কোনও রকম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এই পর্যন্ত প্রকাশে আসেনি। তবে কল্পবিজ্ঞানের রচয়িতারা তাঁদের রচনায় বারে বারে অন্য গ্রহের জীবকে বিষয় হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ও একজন। তাঁর অনেক গল্পে বহির্জাগতিক প্রাণীর প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে বহির্জাগতিক প্রাণীদের নিয়ে যে সকল নতুন চিন্তা-ভাবনা করেছেন সেই দিকগুলোই নির্বাচিত গল্পের আলোচনা অবলম্বনে আমার এই গবেষণা নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সত্যজিৎ রায়ের লেখা ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’-তেই আমরা প্রথম অন্য গ্রহের জীবের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে প্রোফেসর শঙ্কু তাঁর নিজের তৈরি রকেটে চেপে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলেন। মঙ্গলগ্রহে শঙ্কু যে প্রাণীর দেখা পেয়েছেন তারা

> “মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।”[১]

এরা বেশি জোরে ছুটতে পারে না, দৌঁড়াতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। তাদের মুখের ভাষাও শঙ্কু কিছু বুঝতে পারেননি। তারা মুখ দিয়ে বিকট শব্দ করে অনেকটা ঝিঁঝির মতো- “তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি! তিন্তিড়ি!”[২] এরা পৃথিবীর মানুষকে পছন্দ করে না। ফলে শঙ্কুদের সঙ্গে এদের সংঘাত বেঁধেছিল এবং শঙ্কুরা সেখান থেকে পালিয়ে

যান। এরপর শঙ্কুরা টাফাগ্রহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং টাফাগ্রহের প্রাণীরা শঙ্কুদের স্বাগত জানিয়েছিল। টাফাগ্রহের প্রাণী সম্পর্কে শঙ্কু জানিয়েছেন–

> "অতিকায় পিঁপড়ে জাতীয় একটা কিছু কল্পনা করতে পারলে এদের চেহারার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিরাট মাথা, আর চোখ, কিন্তু সেই অনুপাতে হাত-পা সরু--যেন কোনও কাজেই লাগে না।"[৩]

টাফাগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। তাই তাদের কোনও ঘরবাড়ি ছিল না; মাটির ভেতরে গর্তের মধ্যে তারা থাকে। শঙ্কু তাদের মধ্যে কোনও রকম বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা প্রত্যক্ষ করেননি।

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' গল্পেও আমরা অন্য গ্রহের জীবের উল্লেখ পাই। সাধারণত কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলোতে মানবজাতির ধ্বংসের কারণ দু-ভাবে বর্ণিত হয়। এক, পৃথিবীতে বহির্জাগতিক শক্তি বা অন্য কোনও গ্রহ থেকে তেড়ে আসা বিপদ দ্বারা। দুই, পৃথিবীতেই হঠাৎ করে সেই ধ্বংসের কারণ উৎপত্তি হওয়া থেকে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' গল্পে প্রথম বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গল্পে আমরা দেখি সৌরজগতের একটি ক্ষুদ্রতম গ্রহ অজানা কারণে গিরিডিতে উশ্রী নদীর ধারে এসে পড়েছিল। গ্রহটিকে প্রথম দেখেন প্রোফেসর শঙ্কুর প্রতিবেশী অবিনাশবাবু। তিনি সেটিকে আশ্চর্য গোলক ভেবে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। গোলকটি দেখতে

> "বলের মতোই মসৃণ গোল জিনিসটা--তবে সেটা যে কীসের তৈরি তা বোঝা মুশকিল আর তার রংটা বর্ণনা করা বেশ কঠিন। কিছুটা মেটে, কিছুটা সবুজ, কিছুটা আবার হলদে আর লাল মেশানো একটা পাঁচমিশালি রং বলা যেতে পারে।"[৪]

অবিনাশবাবু গোলকটিকে তাঁর বাড়ির আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই গোলকটির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে, সেটাকে প্রোফেসর শঙ্কুর ল্যাবরেটরিতে দিয়ে আসেন। গোলকটি সম্পর্কে অবিনাশবাবু বলেছেন সেটি "কেবল ঘন্টায় ঘন্টায় রং বদলাচ্ছে।"[৫] এরপর প্রোফেসর শঙ্কু সেই গোলকটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তিনি বুঝতে পারেন

> "আমাদের পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই বলের রং পরিবর্তনের আশ্চর্য মিল! তফাত কেবল এই যে, পৃথিবীতে যে পরিবর্তন ঘটতে এক বছর লাগছে-- এই বলের সেটা ঘটতে লাগছে এক দিন, অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা। রাত বারোটায় এই বলের চরম শীতের অবস্থা যখন এর সবটাই বরফের আবরণে ঢাকা। তারপর সেটা কমে গিয়ে সূর্যোদয়ের সময় থেকে লাল হলদে সবুজের খেলায় এর বসন্তকাল। সূর্য যতই মাথার উপরে উঠতে থাকে এই বল ততই গ্রীষ্মের দিকে এগোয় আর রঙের বাহারও কমে আসে।"[৬]

শঙ্কু তাঁর আবিষ্কৃত 'মাইক্রোসোনোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারেন এই গোলকটির নাম 'টেরাটম্' এবং সেই গ্রহের প্রতিটি বাসিন্দা হল এক একটি মূর্তিমান ভাইরাস। যাদের মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলার মতো ক্ষমতা রয়েছে। 'টেরাটম্' গ্রহের প্রাণীরা শঙ্কুকে জানিয়েছে

> "সমস্ত পৃথিবীকে তিন মাসের মধ্যে আমরা জনশূন্য করে দিতে পারি। সংক্রামক রোগের জন্য তো আর হাঙ্গামা করতে হয় না। আমাদের একজনের চেষ্টাতেই সমস্ত গিরিডি শহরটা ফাঁকা করে দিতে পারি। আর সকলে মিলে যদি একজোটে লাগি তা হলে...।"[৭]

এই 'টেরাটম্' গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর জীবকুলের জন্য প্রচন্ড ক্ষতিকারক। তাই গল্পের শেষে দেখা যায় মানব দরদী প্রোফেসর শঙ্কু পৃথিবীর জীবকুলের মঙ্গলের কথা ভেবে টেরাটম্ গ্রহটিকে তার সকল বাসিন্দাসহ ধ্বংস হতে দিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের এই গল্পটির মতো একই বিষয় নিয়ে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলেরও একটি গল্প আছে 'The poison Belt'। এই গল্পটির মূখ্য চরিত্র ছিলেন প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার। আমরা প্রোফেসর চ্যালেঞ্জারকে শঙ্কুর পূর্বসূরী বলে থাকি। এই গল্পের কাহিনিটি ছিল চ্যালেঞ্জার জানতে পারেন পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের এমন পথ দিয়ে এগোবে যেখানে বায়ুতে বিষ মিশে আছে। এর ফলে জীবকুলের যারা শ্বাসপ্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করে, তাদের মৃত্যু আসন্ন। এই সঙ্কট থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করেন প্রোফেসর চ্যালেঞ্জার। তিনি দুইজন বন্ধু ও নিজের স্ত্রীর প্রাণ রক্ষার উপায় করেছিলেন। একই রকম বিষয় নিয়ে ফ্রেডহয়েল লিখেছেন 'The Black Cloud'।

সত্যজিতের অন্য গ্রহের জীব নিয়ে লেখা আরও একটি জনপ্রিয় গল্প হল 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস রহস্য'। এই গল্পে আমরা দেখি অন্য কোনও গ্রহ থেকে উভচর প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছে উপনিবেশের সন্ধানে। এরা দেখতে অনেকটা মাছের মতো। তবে পুরোপুরি মাছের মতো নয় এই প্রাণীগুলোর চেহারা সম্পর্কে শঙ্কু বলেছেন

> "মাছ বলতে আমরা সাধারণত যে জিনিসটা বুঝি, এটা ঠিক সেরকম নয়। এর কাঁধের দুদিকে ডানার জায়গায় যে দুটো জিনিস আছে, তার সঙ্গে মানুষের হাতের মিল আছে, আর এরা সেগুলো দিয়ে হাতের কাজই করছে। লেজটা দুভাগ হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ হয়ে সেটা আর ঠিক লেজ নেই, হয়ে গেছে দুটো পায়ের মতো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে এদের চোখ মাছের মতো চেয়ে থাকে না, এ চোখে মানুষের মতো পাতা পড়ে।"[৮]

তারা সমুদ্রের একেবারে তলদেশে প্রবেশ করে নিজেদের জন্য একটা আস্তানা করেছিল, তারা ভেবেছিল সেখানেই থাকতে পারবে। কিন্তু জলের নীচে তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন, সেইসব উপযুক্ত পরিমাণে ছিল না। তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমুদ্রের উপকূলে উঠে আসে বসবাসের উপযুক্ত স্থান খোঁজার জন্য। কিন্তু ডাঙায় আসার পর তারা মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং মানুষকে তাদের শত্রু ভেবে আত্মরক্ষার জন্য কামড়ে আহত করে দেয়। তারপর তারা পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে এবং তারা অনুভব করে যে পৃথিবী তাদের বসবাসের উপযোগী স্থান নয়। এখানে থাকলে তারা বেশি দিন জীবিত থাকবে না। তাই তারা চলে যাওয়ার মনস্ত করে। কিন্তু চলে যাওয়ার সময়েও আরও এক অন্য বিপদ তাদের সামনে চলে আসে। তারা যে গোলকযানে পৃথিবীতে এসেছিল সেটা সমুদ্রের তলদেশে আটকা পড়ে যায়। গোলকযানটি সমুদ্রের মাটিতে এমন ভাবে আটকে পড়েছিল যে সেটাকে উপরে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু তারা যদি তাদের সেই গোলকযানটিকে সেখান থেকে মুক্ত করতে না পারে তাহলে তাহলে তাদের সকলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। শঙ্কু তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন

> "চোখের সামনে একের পর এক মাছ মরে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ছে-এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছিলাম না।"[৯]

শঙ্কুর ভিনগ্রহের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি জাগে এবং তাদের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। শঙ্কুরা তাঁদের জাহাজ দিয়ে সেই গোলকযানটিকে জোরে ধাক্কা মারে, সেই ধাক্কার জোরে গোলকটি আলগা হয়ে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর তারা সেখান থেকে চলে যায় অন্য কোথাও বাসস্থানের খোঁজে। এখানে শঙ্কুর গ্রহান্তরের প্রাণীদের দুর্দশা দেখে মন খারাপ হওয়া এবং তাদের সহযোগিতা করার বিষয়টি তাঁর চরিত্রের উদার মানবিকতার রূপটিকেই প্রকাশ করেছে।

Erich Von Daniken তাঁর 'Chariots of the Gods?' গ্রন্থে অন্য গ্রহের জীব সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঈশ্বর কী গ্রহান্তরের মানুষ? এরূপ মনে হওয়ার কারণ হল, জনশ্রুতি মতে মিশরের পিরামিড, ইস্টার আইল্যাণ্ডের পেল্লায় মূর্তি, পেরুর ন্যাজকো মরুভূমিতে মাইলের পর মাইল জুড়ে জ্যামিতিক রেখা আর নক্সা ইত্যাদি নানা রকম অতিমানবীয় সৃষ্টি নাকি গ্রহান্তরের প্রাণীরা পৃথিবীতে এসে করেছেন। সুইস দার্শনিক তথা গবেষক Daniken-র মতে হাজার হাজার বছর পূর্বে অন্য গ্রহ থেকে মানুষের চেয়ে অধিক উন্নত কোনও প্রাণী পৃথিবীতে এসেছিল এবং তাদের উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধির কিছুটা মানুষকে শিখিয়ে সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। Daniken তাঁর এই মতের স্বপক্ষে উল্লেখিত গ্রন্থে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। কল্পবিজ্ঞানের এই বিষয়গুলো জ্ঞানান্বেষী সত্যজিৎ রায়কে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। এইরকম বিষয় নিয়ে Arthur C. Clarke-র একটি উপন্যাস রয়েছে '2001: A Space odyssey'। এই গ্রন্থে Daniken-র মতো তিনিও গ্রহান্তরের কোনও প্রাণী পৃথিবীর মানুষেকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কিছুটা অনুমান করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় Arthur C. Clarke-র উপন্যাস শুধু পড়তেনই না, এই ঔপন্যাসিকের তিনি গুণমুগ্ধও ছিলেন। উল্লেখীত দুজনের উপন্যাসের অনুপ্রেরণায় সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন 'মহাকাশের দূত'। ইংল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং বারো বছর পরিশ্রম করে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে 'এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের' একটি গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং জানতে পেরেছেন এই প্রাণীরা পৃথিবীতে কোথায় এবং কখন আসবে। জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেলম ক্রোলের গাড়ি 'অটোমোটেল'- এ চড়ে অনেক বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁরা পৌঁছান লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপের পাশে, যেখানে ধাতব পিরামিড আকৃতির মহাকাশযানটি এসে পৌঁছোয়। ফীল্ডিং সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সংযোগের ভাষা ছিল মৌলিক সংখ্যা "ফর্টি ওয়ান--ফর্টি সেভ্ন—ফিফটি থ্রী--ফিফটি নাইন"[১০] সংযোগ স্থাপনের পর পিরামিড থেকে বেরিয়ে

আসে নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণের নিটোল কণ্ঠস্বর, এরপর তাঁরা জানান "পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।"[১১] তাঁরা আরও জানান- "তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে।"[১২] এবং এই গ্রহের প্রাণীরাই নাকি পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে চালিত করেছেন যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীতে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান, তাঁরা মহাকাশ থেকে পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তাঁরা পৃথিবীতে আসার পূর্বে এখানকার সকল তথ্য সংগ্রহ করে আসেন। তাঁরা এটাও জানিয়েছেন যে, পৃথিবীতে আসার পেছনে তাঁদের কোনও রকম স্বার্থ নেই। কোনও রকম অনিষ্ট করতেও আসেননি বা সাম্রাজ্য বিস্তার করতেও আসেননি। তাঁরা পৃথিবীবাসীর মঙ্গলের জন্য এসেছেন। তাঁরা এটাও বলেছেন যে,

> "আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গরনও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞান পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।"[১৩]

এই ক্ষেত্রে Daniken-র প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাঁরা আরও বলেন যে,

> "মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণিভেদ শেখাইনি কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে তার কারণও হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত তা হলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তাঁর সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে।"[১৪]

পিরামিডের আকৃতির মহাকাশযানের মধ্যে একটা প্রস্তরখন্ড পাওয়া যায়, যার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির সঙ্কট এবং সেই সঙ্কট থেকে সমাধানের উপায়। আর আছে পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। মহাকাশযান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল "সমাধান গুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তা হলে-"[১৫] কিন্তু সেইসময় শঙ্কুদের পেছন পেছন লুকিয়ে আসা মার্কিন ধনকুবের শখের প্রত্নতাত্ত্বিক গিদিয়ান মর্গেনস্টাইন মহাকাশযানের ভেতর থেকে প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে সেখান থেকে পালান এবং রাস্তায় গাড়ি এক্সিডেন্টে মারা যান।

এই গল্পে আমরা দেখি মহাকাশের দূত এসে মানুষকে জানিয়েছেন মানবজাতির ধ্বংসের মূল কারণটি হল মানুষের স্বার্থপরতা। মানুষ তার নিজের সমস্যাগুলোকে নিজে সমাধান করতে পারে না, কারণ মানুষের নিঃস্বার্থ ভাবটি নেই। বর্তমান যুগে ক্ষমতা লাভের নেশায় দেশে দেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে, তারফলে মানবজাতি নিজেই নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনছে। এই গল্পে সত্যজিৎ রায় গ্রহান্তরের জীব দ্বারা বিশ্বমানবতা, উদারতা, স্নেহ, ভালোবাসা ও অহিংসার বাণী পাঠকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গল্পের শেষে শঙ্কু বলেছেন-

> "এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা যোগায়।"[১৬]

এই পর্যায়ের আরও একটি গল্প 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.'। এই গল্পেও আমরা দেখেছি মহাকাশ থেকে একটি অচেনা মহাকাশযান পৃথিবীতে এসেছে। পৃথিবীবাসী অবাক হয়ে দেখেছেন যে, একটি অজানা উড়ন্ত বস্তু (ইউ.এফ.ও.) পৃথিবীর প্রাচীন শিল্প নিদর্শনগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে। এর ফলে গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'পার্থেনন'-ও ধ্বংস হয়েছে। গুঁড়িয়ে গেছে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, কম্বোডিয়ার সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ ইত্যাদি। এই ইউ.এফ.ও.-র রহস্য সন্ধানে শঙ্কু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে চিনের তুর্কিস্থানে গেছেন। তাঁরা তাকলা-মাকানের মরুভূমিতে দরজা খোলা অবস্থায় ইউ.এফ.ও.-এর সন্ধান পেয়েছেন এবং সেই মহাকাশযানের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছেন এটি আসলে পৃথিবীর নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেন্টরির একটা গ্রহ থেকে আসা মহাকাশযান। মহাকাশযানটিকে বিজ্ঞানী কারবোনি আত্মসাৎ করে ধ্বংস লীলা শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী কারবোনি উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁর চাতুর্য ও শয়তানিতে গ্রহান্তরের অতি বুদ্ধিমান প্রাণীরাও হার মেনেছে।

অন্য গ্রহের প্রাণীকে নিয়ে লেখা সত্যজিৎ রায়ের একটি অন্যতম গল্প হল 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। বঙ্কুবাবু কাঁকুরগাছি প্রাইমারি স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক। তিনি প্রচণ্ড শান্ত স্বভাবের মানুষ। কেউ কখনও তাঁকে রাগ করতে দেখেনি। তাঁর নিরীহ স্বভাবের জন্য স্কুলের ছাত্ররাও তাঁর সঙ্গে মজা করে। এমনকী শনি-রবিবারে উকিলের বাড়িতে যে আড্ডার আসর বসে সেখানেও বুড়োরা তাঁকে অপদস্ত করে আনন্দ উপভোগ করে। একদিন সেই আড্ডার আসর থেকে ফেরার সময় বঙ্কুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে আগত প্রাণী 'অ্যাং'-র সঙ্গে। অ্যাং-এর মহাকাশযানটি পথ ভুলে পঞ্চা ঘোষের বাঁশ বাগানে অবতরণ করেছিল। অ্যাং বঙ্কুবাবুকে বলে "আমি ক্রেনিয়াস গ্রহের 'অ্যাং'। মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।"[১৭] সে চোদ্দ হাজার ভাষা জানে। সৌরজগতে যত ভাষা আছে সে সব জানে। এমনকি সৌরজগতের বাইরের একত্রিশটি গ্রহের ভাষা তার জানা সেগুলোর পঁচিশটিতে সে গিয়েছে। পূর্বে তারা জানোয়ার খেতো কিন্তু এখন আর খায় না তা ছেড়ে দিয়েছে। নইলে সে বঙ্কুবাবুকেও খেয়ে ফেলত।

বঙ্কুবাবু যদিও ভূগোল পড়ান কিন্তু তাঁর বাংলাদেশের বাইরে বেরোনো হয়ে ওঠেনি। এমনকি কয়েকটি গ্রাম ও শহর ছাড়া তিনি কিছুই দেখেননি। তিনি হিমালয়ের বরফ দেখেননি, দীঘার সমুদ্র দেখেননি, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখেননি, এমনকি শিবপুরের বাগানের সেই বটগাছটা পর্যন্ত দেখেননি। কিন্তু এসব দেখার একটা সুপ্ত বাসনা তাঁর মনে ছিল। বিচিত্র শক্তির অধিকারী অ্যাং বঙ্কুবাবুর পৃথিবী ভ্রমণের অপূর্ণ আশা পূরণ করিয়েছে একটি বিচিত্র যন্ত্রের সাহায্যে। অ্যাং তার নিজের গ্রহে ফিরে যাওয়ার পূর্বে বঙ্কুবাবুকে একটা উপদেশ দিয়েছে "তবে তোমার দোষ যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করোনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা বা নীরবে অপমান সহ্য করা এসব শুধু মানুষ কেন, কোন প্রাণীরই শোভা পায় না।"[১৮] গল্পে আমরা দেখি অন্য গ্রহের প্রাণীর উপদেশ বঙ্কুবাবুর স্বভাবকে পাল্টে দিয়েছে। পরেরদিন উকিল বাড়ির বৈঠকে বৈশাখী ঝড়ের মতো উপস্থিত হন বঙ্কুবাবু। তিনি যেন এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছেন, এখন আর তিনি নিরবে অপমানকে বরদাস্ত করেন না। শান্ত ও নিরীহ স্বাভাবের বঙ্কুবাবুকে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই যেন গ্রহান্তর থেকে অ্যাং পৃথিবীতে এসেছিল।

'অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু' বহির্জাগতিক প্রাণী নিয়ে লেখা সত্যজিৎ রায়ের আরও একটি জনপ্রিয় গল্প। তর্পণ চৌধুরীর ডাক নাম টিপু। সাড়ে দশ বছরের বালক টিপুর সঙ্গে পরিচয় হয় গ্রহান্তর থেকে আসা জীব গোলাপীবাবুর। গোলাপীবাবু নামটা টিপুই রেখেছে। এরূপ নামকরণের কারণ লোকটির গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় ঠিক তেমন। লোকটির কাছ থেকে টিপু জানতে পারে যে, একজনকে চিমটি কাটার কথা ভাববার অপরাধে তাঁকে শাস্তি স্বরূপ পৃথিবীতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে করা। তিনি যদি টিপুর কোনও দুঃখ দূর করতে পারেন, তাহলে তিনি এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন। এরপর গোলাপীবাবু তাঁর অতিপ্রাকৃত শক্তি দিয়ে জানতে পারেন টিপুর আসল দুঃখের কারণ।

গোলাপীবাবু কন গ্রহ থেকে এসেছেন সেটার উল্লেখ গল্পে নেই। তবে তাঁর চেহারার বর্ণনা গল্পে রয়েছে। ভীষণ বেঁটে, দাড়িগোঁফ নেই, তবে দেখতে বাচ্চাও নয়, গলার স্বর গম্ভীর, গায়ের রং গোলাপির সঙ্গে চন্দন মেশালে যেমন হয় ঠিক তেমন, তাঁর নাম মানুষের জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় না। গোলাপীবাবুদের গ্রহে বেশি জানার চেষ্টা করলে একটা রোগ হয়। তবে সেই রোগের নাম উচ্চারণ করতে দুটো জিভের প্রয়োজন। টিপু তার একটি জিভ দিয়ে উচ্চারণ করলে শব্দটি হয়েছিল 'জিঞ্জিরিয়া'।

সত্যজিৎ রায়ের এই গল্পের সঙ্গে E. M. Forster-র 'The celestial Omnibus' গ্রন্থের কিছুটা মিল লক্ষ করা যায়। এই গল্পে সত্যজিৎ রায় রূপকথা ও বাস্তবতার মধ্যে একটি সমন্ধের কথা বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কীভাবে সমাজের তৈরি করা বাধাগুলো শিশু মনের স্বাভাবিকত্ব ও সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। বর্তমান সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা ছোট ছোট শিশুরা তাদের শিশুত্ব হাড়িয়ে ফেলছে। বর্তমান সময়ে শিশুদের জন্মের পর থেকেই যেন বাস্তব জীবনে জয়ী হওার প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়। রূপকথার কল্পনার জগৎ তাদের সেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে বলে, সেগুলো বর্জন করাই শ্রেয় বলে ভেবে নেয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় কখনওই এমন ভাবনাকে সমর্থন করতেন না। শিশুদের উপর জ্ঞানের বোঝা চাপানোর পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর গল্পে গোলাপীবাবু বলেছেন ওদের গ্রহে বেশি জানার চেষ্টা করলে একটা রোগ হয়। সত্যজিৎ বোঝাতে চেয়েছেন যে, রূপকথার যে বিষয়গুলোকে মানুষ অবাস্তব-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেয়, সেগুলোর মধ্যেও কোনও গভীর অর্থ বা উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই জোর করে শিশুদের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।

উপরে উল্লিখিত আলোচনাতে আমরা দেখলাম সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে যে বহির্জাগতিক প্রাণীদের কল্পনা করেছেন, তাঁরা কেউই মানবকুলের শত্রু নয়। বরং তাঁরা বেশিরভাগই পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে সহযোগিতা করতে। যদিও সত্যজিতের প্রথম পর্যায়ের গল্পে আমরা দুই-একটি মানব বিরোধী বহির্জাগতিক প্রাণীর উল্লেখ পাই, যেমন মঙ্গল গ্রহেরপ্রাণী ও টেরাটম্ গ্রহের প্রাণী। কিন্তু পরবর্তীতে লেখা গল্পগুলোতে আমরা দেখেছি অন্য গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছে মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য। তাঁরা পৃথিবীর সভ্যতা থেকে অনেকটাই উন্নত, অনেক দিক দিয়েই এগিয়ে আছে। এমনকী সত্যজিৎ রায় বহির্জাগতিক প্রাণীকে দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে মানবিকতার বাণী প্রচার করেছেন। মানুষকে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সৎ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

**তথ্যসূত্র:**

১. রায়, সত্যজিৎ। ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। শঙ্কু সমগ্র। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২, পঞ্চদশ মুদ্রণ জুন ২০১৭, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ১৩।
২. তদেব, পৃ. ১৪।
৩. তদেব, পৃ. ১৯।
৪. রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৬৩।
৫. তদেব, পৃ. ৬৪।
৬. তদেব, পৃ. ৭১।
৭. তদেব, পৃ. ৭৩।
৮. রায়, সত্যজিৎ। প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ১২৯।
৯. তদেব, পৃ. ১৩১।
১০. রায়, সত্যজিৎ। মহাকাশের দূত। পূর্বোল্লিখিত পৃ. ৪১১।
১১. তদেব, পৃ. ৪১১।
১২. তদেব, পৃ. ৪১১।
১৩. তদেব, পৃ. ৪১১।
১৪. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৫. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৬. তদেব, পৃ. ৪১২।
১৭. রায়, সত্যজিৎ। বঙ্কুবাবুর বন্ধু। গল্প ১০১। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মে ২০০১, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ০৫।
১৮. তদেব, পৃ. ১৮।